# বিশ্বায়ন এবং ভাষা দিবসঃ বাস্তব বনাম কল্পনা

-বিপ্লব

বাংলা ভাষাটা কি?

আমার অস্তিত্বের কাছে মাতৃভাষা। যে ভাষায় শিখেছি ভালোবাসা। কথা বলিয়েছি আবেগকে। কৈশরের স্বপ্নচারণ, তারুণ্যের বন্ধনহীন প্রেম আর উত্তরগার্হস্থ্যের নিস্তব্ধ পদচারণার সঙ্গামস্থল।

বিবর্তনের চোখে এ ভাষা শিশু। বয়স মেরে কেটে হাজার বছর। ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষাগোষ্টির পুর্বভারতীয় বিবর্তন। সংস্কৃতের কাঠিন্যের পাথরকে ভেঙে যেখানে উদ্ভুত নদীমাতৃক কোমল স্বর। আমাদের হৃদয়টা নরম। তাই ভাষাটাও কোমল। অবাঙালীরা বলে মিস্টি ভাষা। আমরা বুঝি না-মিস্টতা ভাষায় না হৃদয়ে।

এতদিন পর্যন্ত ঠিকই ছিল। বাপ ঠাকুর্দার জেনারেশনে শিক্ষিত বাঙালী মাত্র ই দুলাইন ঠিকঠাক বাংলা লিখতে পারত। আর আমাদের বিশ্বায়নের জেনারেশনকে দেখুন। আমরা বিশ্বনাগরিক হলাম বটে। তবে মূল্যও দিতে হল। আমাদের জেনারেশনের বিশ্ববাঙালী বাংলায় লিখতে ভয় পায়। বা লিখলেও হাজার ভুল ত্রুটি থাকে। কারণটা অবশ্যই এই, ছেলে মেয়ে স্কুলে বাংলা ঠিক ঠাক শিখল কি না, কেও ভ্রুক্ষেপ করে না। বাপমায়ের ভুরু উলটায় অঙ্ক ইংরাজীতে ভুল হলে। সবই বিশ্বায়ান, মানে গ্লোবালাইজেশন বুঝতাছেন! আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বিজ্ঞানে ভালো হলে শিক্ষকরা বলত ভবিষ্যত আছে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। ইংরাজী ভালো জানলে- করে খাবে। আর কেও বাংলা ভালো লিখলে? দ্যাখতো বোধ হয় প্রেম করছে। বাংলা শেখা মানে বড় জোর ব্যর্থপ্রেম! যেন শুধু প্রেমের কবিতা লিখতেই বাংলা কাজে আসে।

এপ্রসঙ্গে কিছু মজার গল্প মনে পরে গেল। আমার বয়স তখন চোদ্দ কি পনের। আমার এক প্রতিবেশী বন্ধু প্রবল প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার প্রেমিকার প্রতি আমারও একটু ছোট খাট ব্যথা ছিল আর কি! হঠাৎ সে একটা খাতা নিয়ে হাজির। তাতে হাজারো প্রেমের কবিতা। আমায় পড়ে শোনাবে! কি গেরো রে বাবা। যার জন্য লেখা, তাকে বাদ দিয়ে আমায় টানাটানি কেন? সেই সময় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটা ডায়ালোগ বাজারে খুব চালু। মেয়েদের গোলাপ দিলে তারা চিবিয়ে ফেলে। তাই গলায় আদর করে প্রেম জানানোই শ্রেয়। আমার বন্ধুটির বক্তব্যও তাই। মেয়েরা প্রেমের ভাষার চেয়ে প্রেমের আদর বোঝে ভালো। তাই তাদের কাছে কবিতা ঘাস পাতার সামিল। অগত্যা তার প্রেমের ভাষা বোঝার দায় বন্ধুবরের।

যাইহোক কৈশরের প্রেমের কবিতা হচ্ছে আমি তুমিতে ভরা তোতলামি। সমস্যা হচ্ছে তাতে বানান ভুল ছিল প্রচুর। আমার নিজের বাংলার অবস্থা করুন, তাও কেউ পড়বেনা জেনে বাহবা দিলাম। সে বেজায় খুশ। হঠাৎ তার মায়ের হাতে

পড়ল  কবিতার ডাইরী। ভদ্রমহিলা এমনিতে বিদুষী। ছেলের বানান ভুল চোখে পড়তে দেরী হল না। আমার বন্ধু ভেবেছিল একটা লঙ্কা কান্ড হবে। সেরকম কিছু হয় নি। ভদ্রমহিলা হেঁসে বলেছিলেন-প্রচুর বানান ভুল, মানে প্রেমটা এখনো গাঢ় হয় নি। তা বাংলায় একটু কাঁচা থাকা ভালো!!!

আরেকটি করুন গল্প বলি। আমাদের উচ্চমাধ্যমিকে কিছু কিছু ছেলের কাছে বাংলা পেপার ছিল বিভীষিকা। প্রায় একশো ভাগ সময় আমরা দিতাম জয়েন্ট এন্টানসের প্রস্তুতি নিতে। ফলে বাংলা পরীক্ষার আগের দিন ছোটাছুটি । আমাদের মধ্যে চাবো ( সম্ভবত শুভ্রজিৎ ঘোষ) বলে একটি ছেলে ছিল বাংলায় দুর্দান্ত ভালো। পরে সে আনন্দবাজারে সাংবাদিক হয়। এখন বি বি সি বাংলায় সাংবাদিক। মোটামুটি ওর নোটের শ খানেক কপি জেরক্স হত। আমি অবশ্য তার চেয়েও বড় ফাঁকিবাজ।  আমার ধারণা বাংলায় নম্বর দেওয়া হয়  ১)ক পাতা লিখেছে ২) ভাষার সৌন্দর্য্য ৩) বানান ভুল কম , এই তিনটি নিয়ামকের ওপর ভিত্তি করে। ভেতরে সাপ ব্যাঙ ঘোড়া কি আছে কেও দেখে না। তা একবার প্রশ্ন এলো বড়ু চন্ডীদাসের ওপর।  উত্তর দিলাম দ্বিজ চন্ডীদাস। এমন নয় যে পার্থক্যটা জানতাম না। শুরুও করেছিলাম শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন দিয়ে, কিন্তু পাতা বাড়াবার জন্য দ্বিজ চন্ডীদাস, দীন চন্ডীদাস সবই জুরে দিলাম।

কারণটা সহজ। আমার ধারণা ছিল বেশী লিখলে বাংলায় কাওকে দশে, চারের কম দেওয়া যায় না। খুব ভালো লিখলে, ছয়ের বেশীও কেও পায় না। যাইহোক গোবিন্দদা দিয়েছিলেন দশে শুন্য-সঙ্গে একটি উপাধি। ডাবগাছতলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তোমাকে বাংলায় পি এচ ডি দেওয়া হইল।

এতো গেল আমার দৈন্যদশা। বোর্ডের পরীক্ষায় গোদা বলে আমার এক বন্ধু বাংলায় টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। যে শিক্ষক মশাই পাহারা দিচ্ছিলেন সে তো থ! বাংলায় টুকলি? তাও বাংলা রচনা?  আরে বাবা কিছু একটা দস্তাখানেক লিখে দিলেইতো নাম্বার পাওয়া যায়! যাইহোক প্রথমবার সেই শিক্ষক মশাই ক্ষমা করে দিলেন এই বলে যদি টুকলিটা বিজ্ঞানে হত, তাহলে কিন্তু রাস্টিকেট করতেন!  যাইহোক তাতেও গোদার বাংলায় চোতা করার প্রচেস্টা থামানো যায় নি। তাকে রাস্টিকেট ই করা হয়। মজার ব্যাপার হল গোদা সেবার আই আই টি এন্ট্রানসেবেশ ভালো র‍্যাঙ্ক করে। কিন্তু বাংলায় টুকলি করতে গিয়ে সবকিছু নস্ট হয়। পরের বছর অবশ্য সে আবার সফল হয়। এখন আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার।

আসলে বাংলার ভালো শিক্ষক চাই। মধ্যম মেধার ছাত্ররাই এখন বাংলার শিক্ষক। ফলে বাংলা পড়াশোনা হয় একদম নীরস ভঙ্গীতে। সেই মানিক, শরৎ, রবীন্দ্রর ওপর গদে বাঁধা প্রশ্নোত্তর।  ফলে শিক্ষক পড়ান, ছাত্র ঘুমায়।

সাহিত্যের শিক্ষক যদি সত্যিকারের রসিক হন, সেই ক্লাশের মজাটাই আলাদা। মফঃশহরের স্কুলে অরুন চ্যাটার্জী নামে এক অসাধারণ বাংলার শিক্ষক

পেয়েছিলাম। সিলেবাসের নাম গন্ধ নেই। ক্লাশের শুরুতেই দাবী উঠত, স্যার কাল প্রেমেন মিত্র মারা গেছে। আজ ঘনাদা ছারা কিছু চলনে না স্যার। কিমবা, স্যার সুনীলের এই গল্পটা বেড়িয়েছে। এটা নিয়েই আজ হৌক। বা দেশে আবুল বাশারের এই গল্পটা ট্যান গেল! এই ভাবেই কেটে গেছে দিনগুলি। আমরা সবাই তাকিয়ে থাকতাম এই ক্লাশটির দিকে।

বাংলা ভাষা টেকাতে গেলে, আরো অনেক অরুন চট্টোপাধ্যায় চাই। কিছু না হোক, শুধু প্রেমের জারকরস হিসাবেই টিকে থাকুক বাঙলা।

ক্যালিফোর্নিয়া ২/২১/২০০৬